



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 837 - 842

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দক্ষিণ দিনাজপুরের মেলার সেকাল ও একাল

জয়া দাস

গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: jaya25das@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Fair, Religious
reform, Pilgrimage,
Industry-based,
Brahmo Samaj,
Bengal, Sankranti,
Traditional,
Modernity.

Abstract

Discussion

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়া দিনাজপুরের কিংবদন্তি জানা যায়। এই দিনাজপুর জেলা রামায়ণ, মহাভারত ও নানা পৌরাণিক কাহিনি সঞ্জীবিত। জেলার ইতিহাস অতীতের স্বর্ণময় অধ্যায়গুলি উন্মুক্ত করে দেয় আমাদের সম্মুখে। মেলা যদিও আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটা বড় অংশ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন -

“প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দিন একাকী। কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।”^১

তবু বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুরেও মেলাকেন্দ্রিক কিছু সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সময়ের বিবর্তনে মেলার আনুষ্ঠানিকতায় শুধু পরিবর্তন এসেছে বৈকি সংখ্যায়ও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এই অঞ্চলে। মেলাকে কেন্দ্র করে বর্ণাঢ্য আয়োজন বহুধা বিস্তৃত। মি. বেস্টল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মেলা সম্পর্কে বলেছেন -

“Periodical gatherings of a large number of people for religious or other landfill purposes.”^২

যা দক্ষিণ দিনাজপুরের সংস্কৃতির ধারাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বিংশ শতকের আশির দশকেও মেলার অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল যাত্রাপালা কোথাও বা কবিগান। বর্তমানে মেলায় কোথাও কোথাও বাউল এর প্রচলন থাকলেও যাত্রা এবং কবিগান প্রায় অবলুপ্ত। তবে মেলার প্রধান আকর্ষণ নাগরদোলা চিরকালের মতো আজও সমানভাবে জনমানসে জনপ্রিয়। এই দিনাজপুরের কোন কোন অঞ্চলের মানুষ সারা বছরে একটি মাত্র আনন্দ উৎসবে মুখরিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে

আগ্রহী হয়ে থাকে। এটা কোনো কোনো এলাকার আঞ্চলিক রীতি। এইসব মেলায় সব ধরনের পণ্যই সহজলভ্য। পূর্বে একসময় মেলাগুলোকেই গ্রাম্য অঞ্চলের লোকেরা পণ্য আদান-প্রদানের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই ভাবনার পুরোটাই বদল ঘটেছে তাও যেমন বলা যায় না আবার কিছু নবীনীকরণ ঘটেছে যেমন- দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা মেলা। এই মেলাকে সেই গ্রামের লোকেরা ঘরের উৎসব হিসেবে মনে করে। কারণ তাদের নিকট আত্মীয়রা থেকে শুরু করে প্রত্যেকের বাড়িতে মেয়ে-জামাই, ছেলে-বউ এই মেলার সময় ঘরে ফেরে। এলাকাবাসী বছরের কেনাকাটাও করে রাখে এই মেলাতেই।

মেলার ধারাবাহিকতা নির্ভর করে সেই অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিশেষত আয়োজকদের সদিচ্ছা, ঐকান্তিকতা, আর্থিক সংগতি এবং সুপরিচালিত পরিকাঠামোর ওপর। দক্ষিণ দিনাজপুর এলাকাবাসী বরাবরই সংস্কৃতি প্রবণ। তারা প্রাচীন সংস্কৃতিতে যেমন মর্যাদা দেয় তেমনি সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে যথেষ্ট তৎপর। মেলায় কেউ আসেন কেনাকাটা করতে, কেউ আসেন প্রাচীন সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে উপভোগ করতে। যদিও ইন্টারনেটের যুগে মেলার নির্মল আনন্দ নেওয়ার স্পৃহা অনেকটা হ্রাস পেলেও মেলাতে ঘুরতে যাওয়ার আকর্ষণে কোনো ঘাটতি হয়নি। মেলায় মানুষের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা কতটা আন্তরিক তা বোঝা যায় যখন দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে উপস্থিত হয় যেমন - বালুরঘাটে রঘুনাথের মেলা। এই মেলার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে ধর্মীয় বিশ্বাস।

হিন্দু মেলার ‘হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যোগেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন -

“হিন্দু মেলা প্রথমে হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একতা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হন যাহাতে সকলেই কায়মনে জাতীয় উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। এই ধারণা ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুক্রমিত হইতে থাকে এবং সপ্তম দশকের মধ্য ভাগেই হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়েরই উন্নতিকল্পে একযোগে চেষ্টা চলিতে আরম্ভ হয়। হিন্দুদের সম্মেলন স্পৃহা যখন কার্যে পরিণত হইল তখন ইহা শুধু তাহাদের মধ্যেই নিষিদ্ধ রহিল না, এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের জন্যে অন্যান্য সম্প্রদায়কেও ইহার মধ্যে টানিয়া আনা হইল, ইন্ডিয়ান লীগ, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য সংসাধনের এক একটি ধাপ।”

মেলার আরেকটি বিশেষ ঐতিহ্যগত দিক হল স্থানকেন্দ্রিক মেলা যেমন- গঙ্গারামপুরের কালীতলার মেলা, বালুরঘাটের খিদিরপুরের বটতলার চড়ক মেলা। যেসব জায়গায় মূলত অনেক লোক একসঙ্গে সমাগম সম্ভব সেখানেই মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক মানুষের বিশ্বাস ও লৌকিকদেবতাকে কেন্দ্র করেই মেলার বসে যেমন- ত্রিকূলের চৌদ্দ হাত কালীর মেলা। বারুনি মেলা তীর্থস্থান নয় তবুও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই বালুরঘাটের চককাশী এলাকায় নদীর ঘাটেই মেলা বসে এবং পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়। দোল পূর্ণিমায় বুলনমেলা, আষাঢ় মাসের রথযাত্রার মেলা, দুর্গাপূজোর দশমী মেলা, চড়ক সংক্রান্তিতে বৃহৎ পরিসরে সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুরে একাধিক স্থানে মেলা বসে। বর্তমানে মেলার উদ্যোক্তাদের কাছে সবচেয়ে বড় সংকট হল স্থান সংকুলান করা। গ্রামীণ মেলাগুলোতে অপসংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপের খবর পাওয়া যায় কোথাও কোথাও। শহরাঞ্চলের লোকেরা যথেষ্ট মার্জিত রুচিশীল হওয়ায় অশ্লীলতার পরিচয় এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না বললেই চলে। স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরেও মেলাগুলোতে পরিচালনা কমিটির সাথে হাতে হাত মিলিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। সুস্থ সংস্কৃতির ধারা বজায় রাখতে স্থানীয় তরুণদের কমিটি মেস্বার করে প্রশাসন ও যুব সমাজ যৌথভাবে যে কোনো মেলার দায়িত্ব পালন করে। এইভাবে তরুণ সমাজকে তাদের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই ধরনের সাংস্কৃতিক বিনোদনের দ্বারাই আমাদের যুব সমাজের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা হয় যাতে তারা বিপদগামীতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা একসময় বৃহৎ দিনাজপুরের অংশ ছিল। এই অঞ্চলের মন্দির, মাজার, মসজিদ, দুরগি, গীর্জা, দেব দেউল এইসব নিয়ে সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বেষ্টিত। এখানে মিশ্র সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। পূজা পার্বনকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ দিনাজপুরের মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। দেশভাগের ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিভাজন

দেখা দেয়। সুসংহত একটা সংস্কৃতির বৃহদাংশ ওপার বাংলায় চলে যায়। শতাব্দীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, গ্রাম বাংলার অনেক প্রাচীন মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে নতুন সংস্কার বিশ্বাস কেন্দ্রিক নানা মেলা। ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে দক্ষিণ দিনাজপুরের অতি প্রাচীন কিছু মেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল -

বালুরঘাটের ডাকরা চন্ডী মন্ডপের দুর্গাপূজো প্রায় তিনশো সপ্তাশি বছরের প্রাচীন। সুধীর চৌধুরীর বংশধরেরা এই একচালা দেবীর আরাধনা করে আসছেন। শাক্ত মতে পাঁঠা বলি দেওয়ার রীতি রয়েছে। মন্দির লাগুয়া একটি অতিপ্রাচীন বটগাছ রয়েছে গাছে রয়েছে সেখানে অসংখ্য বাদুরের বাসা। সেই থেকে জায়গার নাম হয়েছে বাদুরতলা। সেখানেই বসে মেলা, তিন দিনব্যাপী চলে নাম সংকীর্তন। শহরের এই প্রতিমার সর্বপ্রথম বিসর্জন হয় বেহারার দ্বারা হয়। দ্বিতীয় প্রাচীনতম পূজো হল গৌরী পালের সার্বজনীন দুর্গাপূজো প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। ষষ্ঠীর সকালে মায়ের পূজো হয় না, দেবীর বোধন ও অধিবাস হয় সন্ধ্যায়। নবমীতে মাকে আট রকমের মাছ ভোগ দেওয়ার রীতি আছে, উল্লেখ্য আত্রৈয়ী নদীর রাইখর মাছ বরাবরই থাকে ভোগের পদে। অনেকে এই প্রতিমা দর্শন করে তবেই পূজো পরিক্রমা শুরু করেন। দুর্গাপূজোতে বালুরঘাট শহরের দশমীতে নদীর ঘাট জুড়ে বিশাল মেলা বসে। সেখানে যে জিনিস কিনতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ভিড় জমায় তা হল - হলুদ ও সিঁদুর। এছাড়া সকলে মায়ের নিরঞ্জন দেখে বাড়ি ফেরে জিলিপি, নিমাই ইত্যাদি সাথে রকমারি মিষ্টান্ন কিনে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলবাড়ি, মোথাবাড়ি, পতিরাম, বালুরঘাটে বুড়িমার পূজো প্রচলিত আছে। এটি সাধারণত একটি পাথরের মূর্তিকে মা কালী রূপে পূজা করা হয়। বিশ্বাস আছে মায়ের কাছে কোন মনস্কামনা করলে মা পূর্ণ করেন। এই পূজোগুলোও করা হয় শাক্ত মতে। মা স্বপ্নাদেশ কাউকে কাউকে দেখিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বাৎসরিক অনুষ্ঠানে মেলা বসে, কোথাও কোথাও মুখানিত্য হয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, হিলি, বটুন, শিবরামপুরে চামুণ্ডা পূজো হয়। বহু শতাব্দী প্রাচীন হিন্দুদের এই পূজো নিম বা বেল কাঠের তৈরি চামুণ্ডার মুখোশ দেবীজ্ঞানে পূজো হয়। হিলির চামুণ্ডা পূজো সবচেয়ে প্রাচীন প্রায় দুশো বছর এই পূজোর বয়স। সমাজের নিম্নবর্গের লোকেরা ঐতিহাসিক দেবীর আরাধনা করত। তবে বর্তমান সমাজের সব সম্প্রদায়ের লোকেরা এই পূজোয় অংশগ্রহণ করে; পূর্ণার্থীরা মা চামুণ্ডার কাছে মানত করে, ধর্না দেয়। দোকানীরা হরেক রকম পসরা নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়।

বালুরঘাটের রঘুনাথের পূজো বা রামনবমী পূজো বহু পুরনো। এই পূজোকে কেন্দ্র করে বসে মেলা। দুই বাংলাতে রঘুনাথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথের মেলা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলাতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে নিয়ে মাটি নিয়ে এসে বালুরঘাটে পূজা শুরু হয়। এই মন্দিরের প্রথম সেবাইত ছিলেন হরমনি মন্ডল। পরবর্তীতে কিছু মানুষের সহযোগিতায় সেখানে রঘুনাথের মন্দির নির্মিত হয় রামনবমী উপলক্ষে বিশেষ পূজোর আয়োজন করা হয়। খুব ভোরে আত্রৈয়ী নদীতে স্নান সেরে ভক্তরা পূজো দেয়। মন্দিরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে ভক্তরা পূজার নৈবেদ্য হিসেবে ডাব উৎসর্গ করে। পূর্ণার্থীরা মন্দিরে মানসিক করলে পরের বছর সেটা ফলে গেলে জোড়া ডাব দ্বিগুণ রূপে দিয়ে আসে মন্দিরে। জনশ্রুতি আছে এই মন্দিরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার অক্ষত্ব মোচন হয়ে গেছে। বাসন্তী পূজোর অষ্টমী তিথির সন্ধিক্ষণে রাম নবমী পূজা ও মেলার আয়োজন হয়। তাতে লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এই মেলার একটি বড় আকর্ষণ হল সাধুমেলা।

চড়ক পূজোকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুরে চলে লোকউৎসব চরক মেলা। এই পূজো উদ্দেশ্যে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে চড়ক ঠাকুর নিয়ে সাধারণ মানুষ এক মাসের জন্য সন্ন্যাস বৃত্ত গ্রহণ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঠাকুরকে উঠোনের মাঝে রেখে পূজো করে আর সন্ন্যাসীরা গাজন গায়। সেখান থেকে সিধা সংগ্রহ করে সংক্রান্তিতে পূজো হয়। তার আগের দিন হয় নীল পূজো। সেই রাত্রিতে হাজরা চলার করা হয়। বিকেলে কেউ কেউ বড়শি ফুটান। চড়ককে কেন্দ্র করে নদীর পাড়ে বা কোথাও বটতলায় মেলা বসে। মেলায় রকমারি দ্রব্যাদি বসে এই মেলায় গাজন ও লোকক্রিয়া দেখতে মানুষ বিশ্বাস করে ভিড় জমায়।

রথ যাত্রায় সমগ্র বিশ্বে যেমন প্রচলন আছে ভারতবর্ষের প্রাচীন অঞ্চলেরও এই মেলা হয়। রথযাত্রা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রায় প্রতিটি ব্লকে এটি একটি বড় উৎসব। রথ দেখলে রথ টানলে পুনর্জন্ম হয় না স্বর্গবাস হয় এমনই

জনশ্রুতি আছে। তপনের রথের মেলা বিখ্যাত সেখানে রথ টানতে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা ভিড় জমায়। দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বিনশিরার রথ। এই রথযাত্রা উৎসব প্রায় দেড়শ বছরের পুরাতন। এটি লাহা পরিবারের রথ। নবদম্পতির জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করতে যায় বালুরঘাটের রথতলার রথ বেশ পুরনো, তবে দিপালী নগরের রথে বেশি ভিড় হয় এই মেলার মূল আকর্ষণ নটকা।

বালুরঘাটের অদূরে চক্ বাখর গ্রামে দোল পূর্ণিমায় প্রতিবছর চঞ্চলা দেবী পূজো হয়। আদিবাসী ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরাই আয়োজন করে। ভক্তরা মন্দির প্রাঙ্গণে শোলার ফুল বেঁধে দিয়ে নিজেদের মনবাসনা জানায়। দেবীর প্রসাদ হল বাতাস। পূজো উপলক্ষে যে জেলা মেলা বসে সেখানে লোকোক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়। অনেকে দেবীর নিমিত্তে পায়রা উৎসর্গ করে।

হিলিতে চৌদ্দহাত কালীপূজো হয় কার্তিক মাসে। কথিত আছে একাত্তরের যুদ্ধের পর শহীদদের কবর দেওয়া হয় ফলে ওই এলাকায় ভয়ের সৃষ্টি হয়। তারপর থেকে ওই কালীপূজোর প্রচলন। এই পূজাকে কেন্দ্র করে অনেক বড় মেলা বসে। নাগরদোলা থেকে শুরু করে ব্রেক ডান্স প্রভৃতি সাথে থাকে রকমারি খাবার দোকান। হিলির আদুরে ত্রিমোহিনীতে হয় দাপট কালীপূজো চৈত্র সংক্রান্তিতে। কালো পাথরের ভগ্ন শিবলিঙ্গের উপর দেবী মুখোশ পরিয়ে পূজা করা হয়। এই কালীমাতাকে নিয়ে নানান লৌকিক কাহিনীর প্রচলন আছে। হিলি, কামারপাড়া, ত্রিমোহিনী এই অঞ্চলের লোকেরা মনে করেন যে দাপট কালী তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে। এই উপলক্ষে মেলা বসে। মেলায় এসে গ্রামবাসিয়া নির্মল আনন্দ উপভোগ করে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের সবথেকে প্রসিদ্ধ বৃহৎ মেলা হল বোল্লা গ্রামে মা বোল্লাকালীর মেলা। জনৈক জমিদার বল্লভ মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে বল্লভ থেকে বোল্লা নামটি এসেছে। বোল্লাকালী আসলে রক্ষাকালী। জনশ্রুতি আছে এক স্থানীয় মহিলা দেবীমাকে স্বপ্নে পেয়েছেন। আরো একটি জনশ্রুতি আছে ওই অঞ্চলটি জঙ্গলে পরিবেষ্টিত ছিল চুরি ডাকাতি লেগেই থাকতো। ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামের মানুষরা এই পূজো শুরু করেন। সাত ফিট উঁচু বোল্লা মায়ের পূজা হয় রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবারের তিথিতে। মায়ের পূজো হয় শান্ত মতে। হাজার হাজার পাঁঠা বলি মানসিক থাকে ভক্তগণের। তবে মায়ের প্রধান প্রসাদ হল কদমা। এই মেলায় সমগ্র গ্রামবাসীদের আত্মীয়রা আসে। মেলায় হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হয়। ভারতবর্ষ তথা বিদেশীরা এই মেলাতে আসেন তিনদিন ব্যাপী চলে মেলা। গ্রামবাসীরা সারা বছরের কেনাকাটা করে এই মেলা থেকে। এই মেলা আজ সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সার্বজনীন মেলা।

এই দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায় দরগা, ফুরফুরা মাজার রয়েছে পীর সংস্কৃতি এই জেলার আরো একটি সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম। গঙ্গারামপুরের ধলদিঘির পাড়ে পীর সাহেবের আস্তাহার মাজার উল্লেখযোগ্য। তার সমাধির পাশে করম আলী শাহ ফকির একটি মেলার প্রচলন করেন। বুড়া পীরের দরগায় অনেকে ঘোড়া উৎসর্গ করেন। তপন থানার ভিকাহার গ্রামে মকদুম শাহ জালানের দরগা আছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই দরগার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বংশীহারী থানার শ্রীরামপুরের ন্যাংড়া পীরের মেলা একটি বিখ্যাত মহরমের মেলা। এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সেনা যোদ্ধা তৈরি করা। পীর হুসেন শাহ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহে যোগদান করেন এবং আঘাতে পেয়ে খোঁড়া হয়ে যান। তার সমাধি ক্ষেত্রেই মেলা সাড়ে তিন একর জায়গা জুড়ে হয়। একসময় এই মেলা চলতো এক মাস ধরে, বর্তমানে তা তিনদিন ব্যাপী চলে।

বালুরঘাটের মাহীনগরে একটি বড় চার্চ রয়েছে। বড়দিন উপলক্ষে সেখানে মেলা বসে। প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বড়দিনের উৎসব পালিত হয়। বড়দিন আজ সার্বজনীন উৎসব। গঙ্গারামপুরের বাণগড়েও একটি চার্চ আছে। বড়দিন উপলক্ষে চার্চগুলোকে অনেক আলোকসজ্জায় মুড়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন পুতুলের সাহায্যে যীশু খ্রীষ্টের জীবনের নানা ঘটনাকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। প্রচুর লোকের সমাবেশ ঘটে। জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলা এটি।

সময়ের ঘূর্ণাবর্তে সমাজ যেমন আধুনিক থেকে আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছেছে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে, একইভাবে সংস্কৃতিতে সেই প্রভাব পড়েছে। মেলা বলতে জনসাধারণের মনে প্রথমে যে বিষয়টি মনে পড়তো তা হল ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলার সমাবেশ। সেই স্থলে বহু মানুষ একত্রিত হয়ে যেমন দেবদেবীর বেদীতলে নত মস্তকে প্রার্থনা

জানান পাশাপাশি মেলায় গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে আকর্ষণীয় মিষ্টান্ন, জিলিপি কিনে বাড়ি ফেরে। বর্তমানে মেলা ধর্মীয় গণ্ডির সীমাকে অতিক্রম করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিবিধ ধারা বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় পাশ্চাত্যের অনুসরণে সাধারণ প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের মেলা, দেশীয় বাজার মেলা, নমুনা মেলা ও গৃহপালিত পশু মেলা।

গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন -

“আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া, যে কতটা আবশ্যিক ও তাহাও যে আমাদের পক্ষে উপকারী তাহা বোধহয় কাহারো অগোচর নাই। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্যও নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ভারতভূমির জন্য।”^৪

দক্ষিণ দিনাজপুর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী শহর বালুরঘাটে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর সেদিক থেকে যথেষ্ট উন্নত। বছরের নানা সময়ে বিশেষত শীতকালে কৃষি মেলা, সবলা মেলা, বই মেলা, মিলন মেলা, পিঠে-পুলি মেলা, এক্সপো মেলা, ফুল মেলা, চিত্র প্রদর্শনী মেলা, হস্তশিল্প মেলা আয়োজন করে থাকে। এই মেলাগুলোতে একদিকে প্রাণ হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়। বিশেষত সবলা মেলায় মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে কিভাবে সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা ট্রেনিং করিয়ে হাতে তৈরি জিনিস মেলায় বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি ও মৎস্য মেলায় কৃষক ও মৎস্যজীবীদের আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে চাষাবাদ বা ও মৎস্যচাষ করা যায় সে বিষয়ে বিশিষ্ট তথ্য প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর তারা মেলায় তাদের বিশেষ বিশেষ ফলন নিয়ে এসে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। হস্তশিল্প মেলায় ক্ষুদ্র শিল্পীদের হাতে তৈরি জিনিস বিক্রয় করা হয়। শহর কলকাতার মতো দক্ষিণ দিনাজপুরেও বছর দুয়েক হল পিঠে-পুলি মেলা বসে। মিলন ও এক্সপো মেলার আকর্ষণ আধুনিক দ্রব্যাদি, নাগরদোলা, বিভিন্ন রকম খাবার। ফুলমেলা ও চিত্রপ্রদর্শনী মেলায় ক্রয় বিক্রয়ের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। ওখানে শুধুই দেখার ব্যবস্থা থাকে এবং কমিটি বিবেচিত বিশেষ বিশেষ ফুল, ফল ও চিত্রশিল্পীদের বিশেষ ছবিকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানে ভূষিত করে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। বইমেলা বলতে মহানগরের বইমেলা বোঝাত তবে জেলার লোকদের পক্ষে অতটা দূরে যাওয়া যেমন সকলের সম্ভব হয়ে ওঠে না তেমনি জেলাবাসীকে আরো বেশি গঠন-পাঠনে উৎসাহের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুরের কয়েকটি ব্লকের রোটেশন অনুযায়ী বইমেলা বসে। সরকারি উদ্যোগ ব্যতীত বালুরঘাট শহরের মহিলারা কমিউনিটি হল ভাড়া করে স্বনির্ভর হতে বিভিন্ন প্রসাধনী শাড়ি-কাপড়, খাবার বিক্রি করে থাকে। এইভাবে মেলার নব রূপায়ণ হয়েছে। আগামী দিনে আরো বিশেষ ধরনের মেলা এতে সংযোজন হতে পারে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামীণ প্রান্তীয় মেলাগুলি অবলুপ্তির পথে বিশেষ কয়েকটি ব্যতিরেকে। তবে জেলা শহর বালুরঘাটে মেলার সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। গ্রামীণ মেলার চিরন্তন চিত্র পাল্টে যাচ্ছে, সেখানেও আধুনিক দ্রব্যাদি থাকা বসিয়েছে। হস্তশিল্প দ্রব্যাদির তুলনায় মেশিনে তৈরি জিনিস সস্তা হওয়ায় সেগুলোর প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। এছাড়াও মেলায় সার্কাস, ভেক্সি, বাঁদর খেলা দেখানো হত সেগুলো এখন সবই বন্ধ। জাতীয় পশু সংরক্ষণ আইনের ধারায় পশু পাখিদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়ায় এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ খতিয়ে দেখা গেছে আয়োজক পশু পাখিদের স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি কখনোই নজর দিত না মুনাফা লাভই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে সেই শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। তারা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে। মেলা মানে মানুষের সাথে মানুষের মেলবন্ধন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক মেলা প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে সেতুবন্ধন রচনা করে। মেলার লোকসংগীত লোকনৃত্য হারিয়ে গেলেও দক্ষিণ দিনাজপুরবাসী পুনরায় সচেতন দৃষ্টিতে বিষয়গুলিকে নিয়ে বিবেচনা করে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষায় তৎপর। এভাবেই দক্ষিণ দিনাজপুরের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মেলা বেঁচে থাকুক। উল্লেখ্য যে, মেলার দ্বিতীয় বছরের অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি বিখ্যাত গান পরিবেশন করা হয় সেটি হল -

“মিলে সব ভারত সন্তান

একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।^৫

মেলার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব। আশা রাখা যায় পরবর্তী প্রজন্ম জেলায় জেলায় মেলা পালন করে যাবে সংস্কৃতি রক্ষার্থে।

Reference:

১. <https://bn.wikipedia.org>, Time- 9:15pm, Date - 12.12.2025
২. ঘোষ, সমিত, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মেলা ও পূজো পার্বণ', ইকো ফ্রেন্ড অর্গানাইজেশন, দশম বর্ষ ১৪১৬, প্রত্যুষ. ৪৮
৩. মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর, 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত', কলকাতা-৭০০০০৪, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৮
৪. তদেব, পৃ. ১৬
৫. তদেব, পৃ. ২৯

Bibliography:

- দত্ত ভবেশ, 'মেলায় মেলায় আমার দেশ', প্রথম প্রকাশ ৮ই নভেম্বর ১৯৪৮, ভোলানাথ প্রকাশনী ৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
- মিত্র অশোক (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, তৃতীয় খন্ড, ভারত হইতে মুদ্রিত এবং দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশন, সিভিল লাইনে, দিল্লী হইতে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত
- মুখোপাধ্যায় শুভেন্দুশেখর, 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত', কলকাতা-৭০০০০৪, নভেম্বর, ২০০০
- বিশ্বাস, রণজিৎ কুমার, ইন্দিরা প্রকাশনী, ১৯ডি/এইচ/১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০০০৬